বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১১২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১১৩
প্রকাশ ১৩৬১ চৈত্র

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা
৩'১

বাংলা লিরিক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে গোড়াতেই তুলতে হয় চর্যাপদ বা চর্যাগানের কথা। তবে সেই প্রসঙ্গে এও বলে নিতে হয় যে, চর্যাগানের বাংলা এখন আর বাংলা নেই। অর্থাৎ, এগুলোকে আধুনিক বাংলায় খানিকটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিলে এদের বিন্দুবিসর্গ কারোর বোঝবার জো নেই।

তবে শুধু অনুবাদ করে দিলেও যে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে, তা নয়। কারণ, এই পদগুলি একরকম সাংকেতিক ভাষায় রচিত। তার নাম হচ্ছে সন্ধ্যা-ভাষা। সে এক ধূপছায়া-রঙের আবছায়াগোছের আলো-আঁধারে-মেশানো প্রহেলিকাময় ভাষা। তার যে-মানেটা বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে, সেটাই তার আসল মানে নয়। হেঁয়ালির মতো তার এক গুপ্ত অর্থ আছে। সেটা হচ্ছে সাধনতত্ত্বের কথা। যাঁরা ও-পথের পথিক নন, তাঁদের কাছে এর আসল মানে সহজে ধরা-ছোঁয়া দেয় না। কিছু অবশ্য আভাসে ধরা পড়ে, কিন্তু বেশির ভাগেরই নাগাল পাওয়া দায়।

চর্যাগানের ভিতরকার সাধনতত্ত্বের নাম হচ্ছে বজ্রযান বা সহজযান। এটা বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যদের মত। তবে এর বিশেষ সংস্করণ হয়েছিল নেপালে তিব্বতে ও চীনদেশে। এই সম্প্রদায়ের আচার্যদের নাম সিদ্ধাচার্য। সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করার দরুনই বোধ হয় তাঁদের এই নাম। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য লুইপাদ। পণ্ডিতদের মতে তিনি রাঢ়দেশের লোক। এঁরই নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যেরা নিজেদের নামের সঙ্গে 'পাদ' কথাটি যোগ করে নিতেন। যেমন, কিলপাদ, কাহ্নুপাদ, শান্তিপাদ, ভুসুকুপাদ, ডোম্বীপাদ ইত্যাদি। এঁরা সকলেই চর্যাগান বেঁধে গিয়েছেন।

নিজেরা এক-একজন মহা মহা জ্ঞানী পণ্ডিত হলেও প্রচলিত শাস্ত্রে এঁদের বিশ্বাস ছিল অতি অল্প, আর শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডের উপর আস্থা ছিল তার চেয়ে আরো অনেক কম। এঁদের মুখে সর্বদাই ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকল্পের নিন্দা। ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানকে এঁরা বলতেন লোক ঠকাবার মস্ত এক কৌশল। ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসেবে বাহ্যিক ভেখধারণ, ধর্মের নামে বাহ্যানুষ্ঠানের আড়ম্বর— এসব এঁদের দু চোখের বিষ।

তাহলে দেখা যাক এঁরা কি বলে গেছেন। এই সম্প্রদায়ের প্রমাণ-গ্রন্থ শৌরসেনী অপভ্রংশে লেখা দোহাকোষ। তার থেকেই উদাহরণ দিচ্ছি :

বম্‌হণেহি ম জাণন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চচউ বেউ॥
মট্টী পাণী কুস লই পড়ন্ত।
ঘরহিঁ বইসী অগ্‌গি হুণন্ত॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্‌খি উহাবিঅ কড়ুএঁ ধুমেঁ॥

ব্রাহ্মণেরা আসল ভেদের কথা তো জানেন না। তাঁরা এমনি এমনিই চার বেদ পড়ে যান। মাটি জল কুশ ইত্যাদি নিয়ে মন্ত্র পড়েন ; আর ঘরে বসে বসে অগ্নিতে আহুতি দেন। ফলে লাভ কিছুই হয় না। কেবল হোমের কড়া ধুঁয়োয় চোখজ্বালাই সার।

সাধু-সন্ন্যাসীর উপরও সিদ্ধাচার্যেরা বিশেষ সদয় নন :

এক দণ্ডি ত্রিদণ্ডী ভঅবঁবেসেঁ।
বিনুআ হোইঅই হঁস উএসেঁ॥
মিচ্ছেহিঁ জগ বাহিঅ ভুল্লেঁ।
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লেঁ॥

একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী ইত্যাদি হয়ে অনেকে সাধুর ভেখ নিয়ে ঘুরে বেড়ান। পরমহংসের উপদেশে বিজ্ঞ হতে চান। ভুল করে মিছেই ঘর ছেড়ে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তাঁদের ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য-জ্ঞান দুইই সমান।

অনেকে :

অইরিএহিঁ উদ্দ্লিঅ চ্ছারেঁ।
সীসস্থ বাহিঅ এ জড়ভারেঁ॥
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোনহিঁ বইসী ঘণ্টা চালী॥
অক্খি ণিবেসী আসণ বন্ধী।
কণ্ণেহিঁ খুসুখুসাই জণ ধন্ধী॥

গায়ে ভস্ম মাখেন। মাথায় জটাভার ধারণ করেন। অনেকে আবার ঘরে বসে দীপ জ্বালিয়ে ঘণ্টা চালাতে থাকেন। কেউ কেউ চোখ বুঁজে আসনবন্দী হয়ে যোগাসনে বসেন। তাই দেখে মূঢ় ব্যক্তিরা ফিসফিস করে কানাকানি করতে করতে আরো বিভ্রমে পড়ে।

কেউ-বা আবার :

দীহণক্খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ॥
খবণেহি জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্খ উবেসেঁ॥

লম্বা লম্বা নখ রাখেন। মলিন বেশ ধারণ করেন। উলঙ্গ হয়ে মাথার চুল ওপড়ান। ক্ষপণকেরা অতি ক্লেশকর বেশ ধারণ করে আপন আপন মোক্ষলাভের আশায় সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।

কিন্তু :

জই নগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা সুণহ সিআলহ।
লোমউপাড়ণেঁ অথি সিদ্ধি তা জুবই নিণম্বহ॥
পিচ্ছীগহণে দিঠ্ঠ মোক্ষ তা মোরহ চমরহ।
উঞ্ছেঁ ভোঅণে হোই জাণ তা করিহ তুরঙ্গহ॥

উলঙ্গ থাকলেই যদি মুক্তি হত, তা হলে শিয়াল-কুকুরও তো মুক্তপুরুষ। লোম ওপড়ালেই যদি সিদ্ধিলাভ ঘটত, তা হলে তো বলতে হয়, যুবতীর নিতম্বও সিদ্ধিলাভ করেছে। পুচ্ছধারণে যদি মোক্ষ হয় তা হলে তো মউরের চামরও মোক্ষপ্রাপ্ত। আর উচ্ছিষ্ট-ভোজনে যদি জ্ঞানের উদয় হয়, তা হলে হাতি-ঘোড়াও জ্ঞানীপুরুষ।

ব্রাহ্মণ্য ক্রিয়াকর্মের নিন্দা কিন্তু এই প্রথম নয়। এইসব আচার্যের জন্মাবার দু হাজার বছর পূর্বে চার্বাক যে-নিন্দা করে গেছেন, সে আর কহতব্য নয়। সিদ্ধাচার্যেরা তবু তো খানিক রয়ে-বসে-সয়ে আকারে-ইঙ্গিতে সংকেতে-কৌশলে নিন্দা করেছেন, কিন্তু চার্বাকের নিন্দা একেবারে খোলাখুলি। খুবই স্পষ্ট রকমের। সে এতই স্পষ্ট যে, তখনকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাণ্ডারা সে-নিন্দা সহ্য করতে না পেরে চার্বাককে জাতে তুলে নিয়ে তাঁকে একেবারে মুনিঋষির পর্যায়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

চার্বাক বলছেন, ভণ্ড ধূর্ত ও নিশাচর এই তিনে মিলে বেদ সৃষ্টি করেছে। তাদের ধূর্তোমির আর অন্ত নেই। তারা বলে, যজ্ঞে পশুবলি দিলে নাকি সে-পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। তা হলে নিজের বাপকে ধরে যজ্ঞে কোতল করে দিলে তো অতি সহজেই তাঁকে স্বর্গে পাঠানো যায়। আর, মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধশান্তি করলেই যদি তার তৃপ্তি হয়, তাহলে নিবে-যাওয়া প্রদীপে খানিক তেল ঢাললে সে-দীপ আবার জ্বলে ওঠে

না কেন? এসব ব্যবস্থা ব্রাহ্মণরা লোক ঠকিয়ে নিজেদের জীবিকা-অর্জনের সোজা উপায় করার জন্যে নিরীহ নির্বোধ লোকসমাজে প্রচার করেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। চার্বাকের দৌড় কিন্তু ঐ পর্যন্ত। খাও-দাও মজাসে আরাম কর— এই স্থূল পথ ছাড়া চার্বাক আর কোনো পথ দেখাতে পারেন নি। সহজপন্থীরা কিন্তু সাধনমার্গে এমন-এক পন্থা দেখিয়েছিলেন যার জের বাঙালী সমাজ থেকে এখনো মেটে নি।

সিদ্ধাচার্যদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করে বোঝানো আমার সাধ্য নয়। তার জন্যে পণ্ডিতদের ডাকতে হয়। তবে পণ্ডিতেরাও যে এ-বিষয়ে একমত, সেটা মনে করলে অত্যন্ত ভুল করা হবে। কিন্তু তত্ত্বকথা শোনাতে গেলে গভীর জলে নামতে হয়, তখন আর থই পাওয়া ভার। তা ছাড়া, আমি তো কোনো ধর্ম-আলোচনা করতে বসি নি। কাব্য নিয়েই আমার কথা। সুতরাং সেই দোহার পুঁথি থেকেই আমি দুটো দোহা তুলে ধরছি। হয়তো এর থেকে সহজধর্মের মর্ম খানিকটা ভেদ করতে পারা যাবে।

কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জেঁ।
কিন্তহ কিজ্জেই মন্তহ সেব্বেঁ॥
কিন্তহ তিত্থ তপোবন জাই।
মোক্খ কিং লব্ভই পাণী হ্নাই॥

এসো জপহোমে মণ্ডল কম্মে।
অণুদিন অচ্ছসি বাহিউ ধম্মে॥
তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণেহেঁ।
বোধি কি লব্ভই প্রণ বিণ দেহেঁ॥

আন্দাজে-আন্দাজে এর যা মানে বোঝা গেল, সেটা হচ্ছে এই:

দীপ জ্বালিয়েই তোর কি হবে, আর নৈবেদ্য সাজিয়েই-বা তোর কি হবে? মন্ত্রজপ করে আর তীর্থ-তপোবনে গিয়েই-বা তোর কি লাভ?

স্নানাদি করেই কি তুই মুক্তিলাভ করবি ভেবেছিস? ওরে তরুণি, তুই তোর এইসব জপ হোম ইত্যাদি মঙ্গলকর্ম নিয়ে বাহ্যিক ধর্মেই দিন কাটালি। জানিস নে কি তুই, প্রেম ছাড়া মুক্তি নেই। এই দেহে প্রেম বিনে কি জ্ঞানলাভ ঘটে?

কথাটা যখন একবার পাড়লুম তখন আরো একটু খোলসা করে বলি। সিদ্ধাচার্যদের মতে তীর্থ-তপোবন কোথাও যাবার দরকার নেই। কারণ, এই দেহেতেই সব-কিছু আছে। দেহের মধ্যেই সব-কিছু পাওয়া যায় কায়াসাধনের ফলে।

দোহাকোষ বলছেন:

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গাসাঅরু।
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥

এই দেহেরই মধ্যে সরস্বতী যমুনা। গঙ্গাসাগরও এই দেহের মধ্যে। এইখানেই প্রয়াগ বারাণসী। চন্দ্রসূর্যও এই দেহের মধ্যে।

ঘরেঁ আছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্‌খই পড়িবেসী পুচ্ছই॥

ঘরে যে আছে তাকে বাইরে কি খোঁজ কর? আগে ঘর না দেখেই প্রতিবেশীদের কি জিজ্ঞেস কর?

মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ।
সব্ববি রে বড় বিব্‌ভমকারণ॥

মন্ত্র তন্ত্র ধ্যান ধারণা, সবই বড় বিভ্রমের কারণ। কেননা:

পণ্ডিঅ সঅল সত্য বক্‌খাণই
দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জানই॥

পণ্ডিতেরা বাইরের থেকেই সত্যের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। দেহের মধ্যেই যে পরম জ্ঞান বিরাজ করছে, তার খবর তো তাঁরা জানেন না।

এই দোহাগুলির ভিতর গভীর তত্ত্বকথা যাই থাক্-না কেন, সুরে ও ভাবে দুয়েই যে এরা এক-একটা কবিতা, সে-সম্বন্ধে অন্য কারোর মনে কোনো সন্দেহ থাকলেও আমার মনে তো একেবারেই নেই। কারণ, যে-রসের ছোঁয়াচ লাগলে বাক্য রসাত্মক হয়ে উঠে কাব্যের ধাপে পৌঁছয়, সেই রস এইসব দোহাতে আছে। শুধু তত্ত্বকথা হলে কবিতা হত না।

কোনো দেশেই নির্জলা তত্ত্বকথা কি ধর্মসঙ্গীত এমনকি বিশুদ্ধ স্বদেশীমার্কা গানও কখনো বড় কবিতা হয়ে ওঠে নি। কেননা, তাতে সর্বদাই একটা বিশেষ বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। কিন্তু তত্ত্বকথা শোনানো বা কোনো-কিছু প্রতিপন্ন করতে যাওয়া লিরিকের কাজ নয়। তার কাজ হচ্ছে নিছক আনন্দ প্রকাশ করা, আর সেই আনন্দের ধ্বনির দ্বারা অপরের মনের ভিতর আনন্দ জাগিয়ে তোলা।

তাই তো, প্রবোধচন্দ্রোদয় বলে সংস্কৃতে লেখা এক আধ্যাত্মিক নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে এক প্রাচীন আচার্য বলেছিলেন, অদ্বৈততত্ত্বের দ্বারা আর-যা কিছু করা যাক-না কেন, ভালো নাটক কখনো লেখা যায় না। শুনতে পাওয়া যায়, ইংরেজ মহাকবি মিল্‌টন তাঁর লেখা প্যারাডাইস লস্টের একখণ্ড তাঁর পুরনো বন্ধু বাট্‌লারকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। বাট্‌লার-সাহেব কেম্‌ব্রিজে গণিতের মস্ত বড় অধ্যাপক; অঙ্কে তাঁর পাকা মাথা। তিনি বইখানি পেয়ে মিল্‌টনকে লিখে পাঠালেন, তোমার লেখাটা তো একরকম ভালোই বলে মনে হচ্ছে; কিন্তু ওটা কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে। বাট্‌লার-সাহেবের বোধ হয় জানা ছিল না, কাব্য যদি তেড়েফুঁড়ে উঠে কিছু প্রমাণ করতে বসে যায়, তা হলে সেটা তখন আর কাব্য থাকে না, শাস্ত্র হয়ে ওঠে।

হাজার বছর আগেকার লেখা চর্যাগানের ভাষা যে বাংলা, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বেও এই ভাষাকে কেউ প্রাচীন মাগধী, কেউ মৈথিল, কেউ-বা আবার ওড়িয়া ভাষাও বলে মনে করতেন। কিন্তু এখন একেবারে স্থির হয়ে গেছে, এই ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষা। তবে, এই বাংলা ভাষার সঙ্গে তার দু তিন শো বছরের পরবর্তী বাংলা ভাষার একেবারে আকাশপাতাল তফাত। সগোত্র বলেও চেনা যায় না।

বৌদ্ধ আচার্যেরা বরাবরই সর্বসাধারণের নিমিত্ত ধর্মপ্রচার করে গেছেন। সেই কারণে তাঁদের ভাষা ছিল সামান্য লোকের ভাষা। পুরাকালে তাঁরা সংস্কৃতের বদলে তাই প্রাকৃতকেই বেশি মর্যাদা দিয়েছিলেন। সাধারণ লোকের কাছে সহজে সহজধর্ম প্রচারকল্পে বাংলাদেশের সিদ্ধাচার্যেরাও সংস্কৃত ছেড়ে তাই বাংলা ভাষাতেই তাঁদের গান বেঁধেছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে বাংলাদেশে ক্রমশ আবার পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হতে থাকল। বৌদ্ধ আচার্যেরা বিদায় নিলেন কিংবা হিন্দু-সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গুপ্তভাবে রইলেন। চর্যাগানও এদেশ থেকে অন্তর্ধান করল। এ-তল্লাটে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত কারোর জানা রইল না।

এই তো সেদিন অর্থাৎ ১৯০৭ সালে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায় নেপাল থেকে সেগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে ছাপিয়ে দেন। শাস্ত্রীমশায়ের পুঁথিতে এই চর্যাগানের সংগ্রহের নাম দেওয়া আছে— চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। এই নাম ঠিক কি না, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্কবিবাদ আছে। কেউ বলেন, এর নাম হবে আশ্চর্যচর্যাশ্চয়; কেউ বলেন, চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়। চর্যাগীতিকোষবৃত্তি নামও পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের সে-বিতর্কে কাজ কি? গানগুলো যে কি তাই দেখা যাক-না কেন?

সবসুদ্ধ পঞ্চাশটি গান নিয়ে এই সংগ্রহ-গ্রন্থ সম্পূর্ণ। কিন্তু শাস্ত্রীমশায় আড়াইটা পদের সন্ধান পান নি। পরে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাগীতির এক তিব্বতী অনুবাদ থেকে শেষ তিনটি পদ উদ্ধার করেন ; এবং শাস্ত্রীমশায়ের পুঁথির অনেক অশুদ্ধ পাঠকে শুদ্ধ করে দেন। শাস্ত্রী-মশায়ের পুঁথিতে গানগুলোর এক সংস্কৃত টীকাও দেওয়া আছে ; কিন্তু সে-টীকা আসলের চেয়ে এত বেশি ভারী যে, তার আবার এক সরল ভাষ্য না দিলে তার মানে বোঝা মুশকিল। কথাতেই আছে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সহজ জিনিসকে কঠিন করা তো টীকাভাষ্যের চিরকালের রীতি।

লিরিকের একটা মস্ত গুণ এই যে, সম্পদে-বিপদে সুখে-দুঃখে তা মনে মনে গুন্‌গুনিয়ে কিংবা মুখে মুখে আউড়িয়ে অনেক সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আর সেইসঙ্গে এই মর্তলোকেই এক স্বর্গলোক রচনা করে দু দণ্ড পার্থিব ব্যাপারের হাত এড়ানো যায়। কিন্তু চর্যাগানগুলো নিয়ে ঠিক তা করার জো নেই। কারণ, সচরাচর এগুলো ছন্দে উচ্চারণ করা যেমনি শক্ত, টীকাভাষ্য করে বুঝিয়ে না দিলে এর মানে বের করাও তেমনি দুরূহ। কিন্তু এ-সত্ত্বেও একটু ধৈর্য ধরে চর্যাগান নিয়ে চর্চা করলে তার মধ্যে লিরিকের স্বাদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে সেটা হয়তো অনেকের কাছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো একটা বেরসিক কাণ্ড বলে মনে হতেও পারে।

চর্যাগানের দু-চারটে পদের নমুনা দিই। আধুনিক বাংলা ভাষায় কিছু কিছু ব্যাখ্যাও দেওয়া গেল। কিন্তু সে-ব্যাখ্যা বোধ হয় অনেকেরই মনঃপূত হবে না। কিন্তু উপায় নেই। গানগুলি নামে সহজ হলেও তাদের ভাব বের করতে হলে বিস্তর মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়। তবে অক্ষরে অক্ষরে প্রতি শব্দের অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলেও তো অনর্থ

বড় কম নয়। যেমন অনর্থ ঘটিয়েছিলেন এক ইংরেজ সাহেব। ইনি ভালো বাংলা শিখেছেন বলে বড্ড বড়াই করে বেড়াতেন। তাই 'গোপাল-উড়ের যাত্রা'র ইংরেজি পোশাক দিয়েছিলেন— 'the journey of the flying cowherd'।

চর্যাগানগুলি আকারে-প্রকারে অনেকটা পরবর্তীকালের পদাবলীরই মতো। বাঙালীরা সেই আদ্যিকাল থেকেই চুটকি ছড়ার গান লিখতে সিদ্ধহস্ত। কি সংস্কৃতে, কি অপভ্রংশে, কি ভাষায়— সবেতেই এ-ব্যাপারে বাঙালীদের যেমন হাত খুলেছিল ভারতবর্ষের অন্যত্র আর-কারোর হাতে ঠিক তেমনটি খোলে নি। সুতরাং চর্যাগানকে পদাবলীরই অগ্রদূত বলতে কোনোই বাধা নেই।

তখন মুখে মুখে যাঁরা এই বাংলা বলতেন তাঁরা নিশ্চয়ই লিরিকের মতো চর্যাগানের রস অনুভব করতেন। কারণ দেখা যাচ্ছে, সেকালে এই পদগুলিতে সুর লাগিয়ে গান গাওয়া হত। পুঁথিতে প্রত্যেক পদের উপর তা কি সুরে যে গেয়, তার রাগরাগিণীর নাম পর্যন্তও দেওয়া আছে। তবে সেসব রাগরাগিণীর অনেকগুলোই এখন অপ্রচলিত ব'লে শুধু নাম ধরে তাদের সবাইকে আর চেনবার উপায় নেই।

চর্যাগানের নমুনা :

তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ী হোহ ভান্তো॥
তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই মূঢ়হিঅহি ন পইসই॥

কখন যে ব্যাধের শর এসে গায়ে বেঁধে এই ভয়ে হরিণ ঘাস ছোঁয়

না, জলও খায় না। হরিণ-হরিণীতে কাছ-ছাড়াছাড়ি, কেউ কারুর সন্ধান পায় না। তাই হরিণী একদিন হরিণকে দেখতে পেয়ে বললে, শুনছ হরিণ, এ-বন ছেড়ে সরে পড়। সেই শুনে, তীরের মত ছুটল সেই হরিণ। ত্রস্ত হরিণের খুরটুকুও আর দেখা গেল না। ভুসুকুপাদ বলেন, এততেও মূর্খদের মনে কোনো দাগই পড়ল না।

আবার :

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গীপোইআ লীলে পার করেই ॥
বাহতু ডোম্বী বাহলো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরু পাঅপএ জাইব পুণু জিণউরা ॥

গঙ্গা-যমুনার মাঝ দিয়ে নৌকা বেয়ে নিয়ে চলেছে ডোমকন্যা। প্রেমরসে মত্ত সেই কন্যা নায়ে চড়িয়ে অবলীলাক্রমে পার করে দেয়। ডোমকন্যে, দিন তো বেড়ে চলল। বেয়ে নিয়ে চল ডোম্বীপাদকে সেই পরমানন্দে-ভরা জিনপুরে, যেথানে সে সদ্গুরুর পাদপদ্মের দর্শন পাবে।

আর একটি :

কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজ্বাট সংসারা।
বাল ভিণ একু বাকু ণ ভূলহ রাজপথ কন্ধারা ॥
মাআমোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
অগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ণ পুচ্ছসি নাহা ॥
বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ।
ঘাট ণ গুমা খড়তড়ি ণ হোই আঁখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥

কুলে-কুলে আর ঘুরে মরিস নে মিছে। চেয়ে দেখ, এই সংসারের মাঝখানেই তো এক সহজ পথ আছে। শিশুর মতো ভুলে তুই ঐ

সোনাবাঁধানো রাজপথ দিয়ে যাস নে। সে-পথ যেখানে গেছে সেখান থেকে যে আর বেরোবার রাস্তা নেই। মায়ামোহ-ভরা সমুদ্রের তো অন্ত নেই। তার থই পাওয়া ভার। আগে যদি কোনো নৌকা দেখতে পাস তা হলে সন্ধানী লোককে পথ জিজ্ঞেস করে নে। শান্তিপাদ বলেন, ডাইনে-বাঁয়ের দু পথ ছেড়ে তুই মাঝখানের সহজপথ দিয়ে চল। এ-পথে ঝোপঝাপ নেই। চোখ বুঁজেই তুই চলে যেতে পারবি।

আরো কয়েকটা চর্যাগান :

অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥
অম্হে ণ জানহু অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেসো॥

মানুষ আপনার মনে আপনিই জন্মমরণের কথা রচনা করে মিছিমিছি নিজেকে বন্ধনে জড়ায়। অচিন্ত্য যা, তাকে আমি জানব কি করে? কেমন করে এই ভবে জন্মমৃত্যু ঘটে, জানি নে। শুধু জানি, জন্ম মরণ দুইই এক। জন্মও যেমন করে হয়, মৃত্যুও তেমনি করে হয়। প্রভেদ বড় কিছু নেই।

উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥

উঁচু উঁচু পর্বতের উপর শবরদের বাস। সেখানে আছে শবরকন্যা।

তার পরিধানে ময়ুরপুচ্ছের কটিবাস, গলায় কুঁচের মালা। মত্ত শবর পাগলপারা উন্মুখ হয়ে বেড়ায়। শবরী বলে, দোহাই তোমার শবর, গোল কোরো না। চেয়ে দেখ, আমি তো তোমারই ঘরণী আছি। নাম আমার সহজসুন্দরী।

তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু॥
তউসে হেরুঅ ণ পাবিঅই।
সান্তি ভণই কিণ স ভাবিঅই॥

তুলো ধুনতে ধুনতে আঁশে গিয়ে দাঁড়ায়। আবার আঁশ ধুনতে ধুনতে আঁশ অদৃশ্য হয়ে যায়। কেন যে এরকমটা হ তার কারণ পাওয়া ভার। শান্তিপাদ বলেন, কিসের থেকে যে কি হয়, তা তো ভেবেই পাই নে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গস সাপ বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমাঅ॥

টিলার উপর আমার ঘর। প্রতিবেশী কেউ নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই। নিত্য অভাবের সংসার। ঘরে যে ব্যাঙ আর সাপ বেড়ে উঠল। ভাগ্যহত হলে আর কি কপাল ফেরে? দুধটুকু দুহে নিলে আর কি তা গোরুর বাঁটে ফিরে যায়?

চর্যাগানের পর প্রায় দু শো আড়াই শো বছর ধরে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র একেবারে ফাঁকা। পালরাজারা ছিলেন এ-দেশেরই লোক। তাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তাঁদের আশ্রয়ে একদিকে যেমন বাঙালী সংস্করণের

বৌদ্ধধর্ম, ওদিকে তেমন বাঙালী সংস্করণের ব্রাহ্মণ্যধর্ম পাশাপাশি চলেছিল। আর তাদেরই সঙ্গে একাধারে প্রচার ছিল দেশজ হিন্দুধর্ম। কিন্তু সেনবংশীয়েরা অন্যত্র থেকে এসে শেষে বাংলাদেশের রাজা বনে গেলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মও বুঝতেন না, এ-দেশের লৌকিক ধর্মেও তাঁদের আস্থা ছিল না। তাঁরা রপ্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মে। ঝোঁকও তাঁদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর।

সেনরাজাদের দরবারে তাই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আদর বেশি হল। চারদিক থেকে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য আচারের প্রতিষ্ঠা করার প্রাণপণ চেষ্টা চলতে লাগল। নতুন করে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্র রচনা হল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বাহন যে সংস্কৃত ভাষা, তারও প্রচার বাড়ল। দেশের প্রাকৃত ভাষা অনেক পিছনে পড়ে রইল। তখনকার জ্ঞানীগুণী ভদ্রলোকেরা লিখতেন পড়তেন সংস্কৃতে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথাবার্তা তর্কবিবাদ চলত বোধ হয় ঐ সংস্কৃত ভাষায়। বাংলা হয়ে গেল অসাধু গ্রাম্য ভাষা, সাধারণ ইতর লোকদের ব্যবহারের নিমিত্ত। লেখাপড়া জানা পণ্ডিত ব্যক্তিরা সে-ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখতে লাগলেন।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের সহজধর্মকে এ-দেশ থেকে তাড়ানো সহজ হয় নি। সেটা শুধু ভদ্রজনের হাত ফিরে নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘাড়ে চেপে বসে গেল। তার পর বাংলাদেশে নবাগত ব্রাহ্মণ্যধর্মকে এই অশাস্ত্রীয় সহজধর্ম বারবার ঘা দিতে দিতে তার চেহারাটা ক্রমশই বদলিয়ে দিতে লাগল। দেখা গেল, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম আস্তে আস্তে প্রচলিত ভক্তিধর্মে কিংবা শাক্তধর্মে রূপান্তরিত হচ্ছে।

সিদ্ধাচার্যদের সহজধর্ম এ-দেশের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কতদূর প্রবেশ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ নিম্নশ্রেণীরই সাধুসন্তদের মুখে রূপক অলংকারে রচিত গানে। আউল বাউল সাঁই দরবেশ ইত্যাদির গানে

এই সহজধর্মকেই তো আমরা স্পষ্ট করেই দেখতে পাই। সহজধর্মের প্রভাব তো প্রতিভাত হচ্ছে বাংলা লিরিকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। আর তারই দৌলতে তো বাংলাদেশে দোল-দুর্গোৎসব পাশাপাশি চলেছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব মনের সুখে একত্র বাস করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলমানী আমল আসতেই ধরা পড়ে গেল, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাংলাদেশের লোকদের কাঁধে স্থায়ীভাবে ভর করতে পারে নি। কি ভদ্রলোকদের আর কি নিম্নস্তরের লোকদের কারোরই নয়। অবশ্য গোড়াতেই তেমন কিছু হয় নি। কিন্তু মুসলমান আক্রমণের প্রথম ধাক্কার ঝড়ঝাপটা থেমে যাওয়ার পর, অরাজকতার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে লোকে একটু থিতিয়ে বসতেই যেখানে যত লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবী ছিলেন তাঁরা সবাই গা-ঝাড়া দিয়ে একে একে বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁদের স্তবস্তুতি করে বিস্তর খণ্ডকাব্য রচনা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাও চলতে লাগল এইসব গ্রাম্য দেবদেবীকে জাতে তুলে নিয়ে বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে এক-আসনে বসানোর। এ-চেষ্টা এখনও চলেছে, থামে নি।

মুসলমানী আমলেই আবার বাংলা লিরিকের প্রসার ঘটল। যদিও ব্রাহ্মণ্য ইতিহাস-পুরাণে এর কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, তবুও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়রহস্যের কথা বাংলাদেশের লোকসমাজে অনেকদিন ধরেই প্রচলিত ছিল। এ-দেশের লোকের কাছে এই প্রণয়কেলির কথা যেমন সহজে বোধগম্য তেমনি সহজেই উপভোগ্যও বটে। সুতরাং এই সময়ের কবিরা যেসব গান বাঁধতে লাগলেন তার বিষয়বস্তু যে এই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকেই নিয়ে হল, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে যেসব বাংলা লিরিকের সৃষ্টি হল তার আমরা নাম দিই পদাবলী। পুরনো বাংলায় লেখা চর্যাপদ তো ছিলই, তা ছাড়া অপভ্রংশে লেখা অনেক রকমের প্রাচীন লৌকিক ছড়াগানও ছিল। আবার সেনরাজাদের আমলে সংস্কৃতে লেখা লিরিক রসে ভরা ছোট ছোট চূর্ণ কবিতাও চোখের সামনে ছিল। সুতরাং বাংলা লিরিক যে পদাবলীর আকার ধারণ করবে তাতে আর বিচিত্র কি ?

এই সময়কার বাঙালী কবিদের সামনে কাব্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একটা আদর্শ মজুত ছিল। সেটি শ্রীজয়দেব-কবির বিরচিত সংস্কৃতে লেখা একটি খণ্ডকাব্য, গীতগোবিন্দ। এটি রাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গের একটি পালাগান। কবি জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণসেন বাহ্যিকে ব্রাহ্মণ্য আচার রক্ষা করে চললেও মনে মনে পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁকে খুশি করার জন্যে বোধ হয় জয়দেব এই পালাগান রচনা করেছিলেন। কিন্তু বলার মধ্যে না-বলা, কিংবা না-বলার মধ্যে বলার আর্টটুকু জানা না থাকার দরুন জয়দেব-কবির গীতগোবিন্দ-কাব্য বড়-গোছের ধর্মগ্রন্থই হয়ে আছে, উঁচুদরের কাব্যগ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে নি।

গীতগোবিন্দে সুরের প্রচুর ঝংকার আছে বটে, কিন্তু তাতে লিরিকের ধ্বনি নেই। শব্দ কেবল শব্দই হয়ে রয়ে গেছে, তাতে শব্দের ব্যঞ্জনা নেই। তবে স্থানে স্থানে নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই যেন একটু-আধটু ধ্বনি ফুটে বেরোচ্ছে।

যেমন গোড়াতেই :

> মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।
> নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়॥

ছোট্ট দুটি লাইনে তমালবৃক্ষরাজিঘন শ্যামল বনভূমির যে মনোহর চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল, সেটা অনুপ্রাসের গুণে কিংবা

আর-কোনো অলংকারের বাহারে নয়। শুধু বাক্যসংযমের ফলে। তাই তো একজন ফরাসিস্ কবি বলে গেছেন, 'তুমি যা বললে তা তো আমি দু কান দিয়েই শুনলুম। কিন্তু তুমি যা বলতে গিয়েও বলতে পারলে না, সেটা যে কি, তাই ভাবতে ভাবতে আমার দিন কাবার হয়ে এল।' আসলে সেইটেই তো হল কাব্য।

কিন্তু ফাঁকা শব্দের ঝংকারও যে মানুষের মনকে কতখানি আকৃষ্ট করতে পারে তারও নিদর্শন গীতগোবিন্দে অনেক আছে।

যেমন :

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥

কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে মনকে আকৃষ্ট করলেও এটা বেশিক্ষণ মনে বসে না। বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এটার শেষ হয়ে আসে। এতে এমন কোনো ব্যঞ্জনা নেই যে, বলার পরও সেটা মনে জেগে থাকবে। তবে মানুষের শিশুর মতো মন ছন্দের ঝংকারের কাছে চিরকালই পরাভব মেনে এসেছে। তাই, বাংলার গীতগোবিন্দ-কাব্যের আদর ভারতবর্ষের সর্বত্র।

এই কাব্যে একটি লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, এটি যদিও সংস্কৃত ভাষায় লেখা, কিন্তু সে-সংস্কৃত প্রায় ভাষায় এসে ঠেকেছে। আর সেই সঙ্গে এও দেখা যাচ্ছে, গানের যা স্বাভাবিক ছন্দ, সেই শব্দমিলের ছন্দই এখানে প্রবল হয়ে উঠেছে। শুধু তালের ছন্দের উপর এর নির্ভর নয়।

যেমন :

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শংকিত ভবদুপয়ানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্॥

কিংবা :

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং
মধুরকোমলকান্তপদাবলীম্
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্।

অথবা :

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল এ।
কলিতললিতবনমাল জয় জয় দেব হরে॥

অনুস্বর বিসর্গগুলো বাদ দিলে এ তো বাংলা! আর, বাংলা লিরিকেরও তো এই সুর এই রূপ। এই কারণেই বোধ হয় অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে, জয়দেব-কবি গীতগোবিন্দ-কাব্য প্রথম বাংলাতেই রচনা করেছিলেন, তার পর ভদ্রসমাজে প্রচারের উদ্দেশে অনুস্বর বিসর্গ জুড়ে তাকে সংস্কৃত করে তোলেন। হবেও বা! পণ্ডিতদের কথা অবশ্যই মান্য করতে হয়।

গীতগোবিন্দকে আদর্শ বলে ধরলেও আর তার ভাবরসে মগ্ন থাকলেও এবং তার ছন্দকে আঁকড়ে ধরে রইলেও বাংলা ভাষায় কিন্তু যেসব লিরিক সৃষ্টি হল, তাদের প্রাণবস্তু ছিল আরো ঢের বেশি গভীর। মানুষের খোলা মনের ঠিক মাঝখান থেকেই যেন সেগুলো ছন্দের ফুল্‌কি হয়ে বেরিয়ে আসছে। অতি সহজ, অতি সুন্দর, অতি মিষ্টি।

বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত রচনার আদর কমে আসতে লাগল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের রাজদরবারে আর তেমন খাতির রইল না। বাধ্য হয়েই লোকদের শেষে ভাষার আশ্রয় নিতে হল। আশ্চর্য এই যে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশেই প্রায় এই একই সময়ে ভাষায় রচিত কাব্যসাহিত্য শুরু হয়।

সবদেশেই গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হয় কাব্যসাহিত্যের অনেক পরে। গদ্য হচ্ছে প্রধানত কারবারের ভাষা। যে-গদ্য সাহিত্যের বাহন, বাংলাদেশে সে-গদ্য তৈরি হতে আরো পাঁচ শো বছর সময় লেগেছিল। আর-এক বিদেশী রাজত্বের সংস্পর্শে এসে এই গদ্যের আরম্ভ হয় ও কালে কালে তার উন্নতি ঘটে। ইংরেজদেরই চেষ্টায় আর সাহায্যেই যে বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা, এ-কথা এক উৎকট স্বদেশাভিমানী ব্যক্তি ছাড়া আর সকলেই স্বীকার করবেন। তা ছাড়া, সাহিত্যের গদ্য যুক্তিমার্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর জীবনে ভক্তিমার্গ ছেড়ে যুক্তিমার্গের ধারা আরম্ভ হয় সেই উনিশ শো শতাব্দীর শুরু থেকে।

মুসলমান রাজত্বকালে বাংলাদেশের কারবারী ভাষা ছিল ফার্সী। কিন্তু মুশকিল এই যে, মানুষের তো কেবল কারবার নিয়েই কাজ চলে না। মনের কথা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে না-পারলে মানুষের দিন কাটে না। এরই তাড়নায় তো মানুষ পদ্য লেখে। কারণ, পদ্য এক-মানুষের মনের কথা অন্য-মানুষের মনের কাছে পৌঁছে দিতে একেবারে পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। তাই, মনের কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে বাংলাদেশের লোকেরা বাংলা ভাষাতেই পদ্য-রচনা শুরু করে দিলেন।

সংস্কৃতের আঁটসাঁট পোশাকী ভাষা ছেড়ে বেশ ঢিলেঢালা আটপৌরে বাংলা ভাষাতে মনের কথা ব্যক্ত করতে পারায় লাভ হল এই যে, ভাষায় লেখা পদ্যগুলো এক-একটা আদত লিরিক হয়ে উঠল। আর সেইসঙ্গে বাংলা ভাষাও পেল বাংলাদেশেরই একটা নিজস্ব রূপ। এই সময় থেকেই বাংলা ভাষা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল।

ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে যাঁরা মশগুল তাঁরা জানেন, ইংরেজ কবি চসারের ইংরেজির সঙ্গে ইংরেজি বাইবেলের আর মহাকবি শেক্সপীয়রের

ইংরেজির তফাত কতখানি। আর, তার সঙ্গে এও জানেন যে, আজকালকার ইংরেজির সঙ্গে বাইবেল আর শেক্সপীয়রের ইংরেজির বৈষম্য কত কম। সেইরকম, বাংলা ভাষা এই সময়কার কবিদের হাতে পড়ে যে-চেহারা নিল, তার সঙ্গে আজকালকার ভাষার আকৃতি- ও প্রকৃতি-গত বৈষম্য ঠিক ততখানি কম। আর, ঠিক ততখানি বেশি প্রভেদ চর্যাগানের পদের সঙ্গে আজকালকার পদ্যের।

ভাব ও কথার বৈচিত্র্য ও প্রসার এখন অনেক বেড়ে গেলেও, পনেরো শো থেকে সতেরো শো শতাব্দীর বাংলা কবিতার রূপ তখনো যা ছিল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পর্যন্ত প্রায় সেই একই রকম ছিল। আমার কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে আমি সেকালের কতক প্রসিদ্ধ পদকর্তার পদ উদ্ধার করে উপস্থিত করছি। তবে সমভাব রক্ষা করার জন্যে স্থানে স্থানে পদগুলি সামান্য একটু কাট-ছাঁট করে নিয়েছি। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখবেন যে, টীকা-টিপ্পনী ছাড়াও সেগুলো বেশ বুঝতে পারছেন, রসাস্বাদনে কোনো বাধা পাচ্ছেন না।

বাঙালী পদকর্তাদের আদিগুরু চণ্ডীদাস। তিনি যে খাঁটি বাঙালী ছিলেন, সে-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ নেই। তবে, আমরা যে-পদকর্তা চণ্ডীদাসকে জানি, পণ্ডিতদের মতে তিনিই যে ঠিক এই চণ্ডীদাস, তা নাও হতে পারেন। বস্তুত পণ্ডিতেরা অনেকগুলি চণ্ডীদাসের খবর পেয়েছেন, একটি আধটি নয়। শুধু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ইত্যাদি হরেক রকমের চণ্ডীদাস। সুতরাং কোন্‌টি যে কে, তা আমরা সঠিক বলি কি করে? চণ্ডীদাসের দেশ সম্বন্ধেও অনেক তর্কবিতর্ক আছে। কেউ বলেন, তাঁর বাস ছিল বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে; আবার কেউ বলেন, বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে। বড়

গোলমেলে কথা। তা আমাদের অত গোলমালের ভিতর ঢুকে কি লাভ? নাম-ধাম গাঁইগোত্র সঠিক জানা না থাকলেও ভালো কবিতা পড়ার আনন্দ থেকে কে আমাদের ঠেকাতে পারে? আমাদের কাছে পণ্ডিতদের বারদুয়ার বন্ধ থাকলেও আমাদের মনের ভিতরদুয়ার যে খোলা। আর, সেইখান থেকেই তো নন্দনকাননের পারিজাতপুষ্পের গন্ধ ভেসে আসে।

কিন্তু একটা কথা আছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এঁরা সব বড় বড় কবি বলে তাঁদের পরবর্তী অনেক পদকর্তা নিজেদের লেখা পদ ঐ দুই মহাকবির নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এতদিন পরে কোন্‌টি যে সত্যিকার চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদ, আর কোন্‌টি যে নয়, তা স্থির করতে গিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

চণ্ডীদাসের পরেই আসেন বিদ্যাপতি ঠাকুর। বিদ্যাপতি কিন্তু মৈথিল। তা হলে কি হয়? আমরা অনেকদিন আগের থেকেই তাঁকে বাঙালী কবি বলে মেনে নিয়েছি এবং সেই সম্মানই তাঁকে দিয়ে এসেছি। আর দেবই-বা না কেন?

চণ্ডীদাসের পদ:

> বসিয়া অবন্তীপুরে পড়ুয়া পড়ন পড়ে।
> হেনকালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে॥
> সে যে চাহিল আমার পানে হানিল মদনবাণে।
> সেই হতে মন করে উচাটন ধৈরজ না মানে প্রাণে॥
> সে যে রসের পুতলী বালা তার মদনমোহন লীলা।
> চেতন সহিতে চড়ি মনোরথে করয়ে বিবিধ খেলা।
> তার পর দিনে দেবী আরাধনে বসিলাম যতন করি।
> ওই শুভক্ষণে দেবীর আঙ্গিনে পেখলু সেই গৌরী॥
> হায় মন চলি গেলা কেন?
> দেখিয়া সেরূপ নবীন পীরিতি স্মরণ লইলা যেন॥

শুন শুন দেবি কহি তোমা আমি সবই বিফল মোর।
পুণ্য ধর্ম গেল মোক্ষাদি সকল চরণ না পেলাম তোর॥
চণ্ডীদাস কয় সত্য এই হয় স্বভাব স্বরূপ দেহা।
বাশুলী বচনে সত্য জানি মনে ধোবিনী সঙ্গতি লেহা॥

বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
জাতি কুল শীল মান॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
পরিতে গলায় সুখ॥
সতী কি অসতী তোমারি বিদিতি
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম
তোমারি চরণখানি॥

সকলি আমার দোষ হে বন্ধু
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করেছি পিরীতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
খাইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয়না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা॥

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘসিতে সৌরভময়।
ঘসিয়া আনিতে হিয়ায় লইতে দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই কে বলে পিরীতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে দুখ উপজিল ফিরা॥
পরশপাথর শীতল বড়ই বলয়ে সকল লোকে।
মুই অভাগিনী লাগিল আগুনি পাইলুঁ এতেক শোকে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি এমতি না হয় কারে।
এ পাপ পড়সী ডাকিনী সদৃশী সকলি দোষয়ে মোরে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায় পরাণ সহিবে কত॥
নানুরের মাঠে গ্রামের নিকটে বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে সুখ সে পাইবে কোথা॥

শুন হে রসিকরায়।
তোমা উপেখিয়া যে সুখে আছিলুঁ নিবেদিয়া তুয়া পায়॥
কি জানি কি খেনে কুমতি হইল গরবে ভরিয়া গেলুঁ।
তোমা হেন বঁধু হেলায় হারাইয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈলুঁ॥

জনম অবধি মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখিগণ দেখে প্রাণসম পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
সখিগণ কহে শ্যামসোহাগিনী গরবে ভরল দে।
হামারি গরব তুঁহু বঢ়ায়লি অব টুটায়ব কে॥
তোমারি গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমারি রূপে।
কুলশীল লাজে জলাঞ্জলি দিয়ে মজেছি রসের কূপে॥
তোমারি গরবে গরবিনী আমি গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কয় এমতি নইলে পিরীতি কিসের সুখ॥

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেড়ল মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালেম সাগর বাঁধলেম মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি মরণ অধিক শেল॥

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥

কোন বিধি সিরিজিল সোঁতের সেহালি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইরা রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
একুলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলে অখলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিষে যদি নাহি দেখি তবে যে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

এর পর বিদ্যাপতি:

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন জৌবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা ।
পাঁচ বান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
অবহন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
তবহি মানব নিজ দেহা ।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানইতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল ।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গমাওল
না বুঝিনু কৈসন কেল ।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে না মিলিল এক ॥

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখিক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হম তুহু জানি॥
তুহু কইসে মাধব কহ তুহু মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহু দোহা হোয়॥

এ ধনি কমলিনি সুন হিত বানি।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইত কনক দ্বিগুণ হোয় মূল॥
টুটইত নহি টুট প্রেম অদভুত।
জৈসন বাঢ়এ মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজ মোতি নহি মানি।
সকল কণ্ঠ নহি কোইল বানি॥
সকল সময় নহি রীতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহি গুণবন্ত॥
ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

নব অনুরাগিনি রাধা।
কিছু নহি মানএ বাধা॥
একলি কএল পয়ান।
পথ বিপথ নাহি মান॥

তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানএ ভার॥
কর সয়ঁ কঙ্কন মুদরি।
পথ হি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জির পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
জামিনি ঘন আঁধিয়ার।
মনমথ হিয় উজিয়ার॥
বিঘনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছে না হেরিয়ে আন॥

তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমনি সমাজে।
তোহে বিসারি মন তাহে সমাপলু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হম পরিণাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর সমানা ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমন ভয়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদি নাথ কহায়সি
ভবতারন ভার তোহারা ॥

আর-একটু বিস্তৃতভাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদগুলো নিয়ে আলোচনা করে দেখলে ধরা পড়ে যাবে, চণ্ডীদাসের প্রেম স্থির ধীর শান্ত স্নিগ্ধ। তাতে বিরহের দহন আছে, কিন্তু যৌবনের দপ্পানি নেই। বিদ্যাপতির প্রেম সদাই সচকিত, আপনাতে আপনি বিভোর। যেন নবযৌবনের জোয়ারে হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়।

চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি দু জনে মিলে যে-পথ দেখিয়ে গেলেন, সে-পথ বেয়ে প্রায় তিন শো বছর ধরে অনেক বাঙালী কবি তাঁদের গান গেয়ে গেছেন। পনেরো শো শতাব্দীতে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বাংলা কাব্যসাহিত্য এক নতুন শক্তি পেল। নৈয়ায়িক আর স্মার্ত পণ্ডিতেরা যাই বলুন-না কেন, চৈতন্যদেবের সহজ প্রেমধর্ম বাংলাদেশের মরা গাঙে এমন এক বাণ ডেকে আনল যে, তার বেগ বাংলা লিরিককে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহাপ্রভুর শিষ্য-প্রশিষ্য ও তাঁদের শিষ্যানুশিষ্যরা গৌরাঙ্গের মর্তলীলায় বাংলা লিরিকের আর-এক উৎস খুঁজে পেলেন, এবং তাতে উৎসাহিত হয়ে কবিতা লিখে ফেললেনও বড় কম নয়।

তবে সব পদকর্তাই যে ভালো কবিতা লিখতে পেরেছেন, তা নয়। পরবর্তীকালের অনেকেই একটা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই কবিতা রচনা করে গেছেন। কবিতা দিয়ে আনন্দ বিতরণ করার চেয়ে তাই

নিয়ে ধর্মপ্রচার করার দিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছিলেন। যাঁরা কবিতা লিখে থাকেন বা যত্ন নিয়ে কবিতা পড়ে থাকেন তাঁরা সকলেই জানেন, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কবিতা লিখতে বসলে সেটা আর যাই হোক, কখনো কবিতা হয়ে ওঠে না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের পরবর্তী যেসব পদকর্তা কবিতা লিখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস ও লোচনদাস প্রসিদ্ধ। এঁরা ইংরেজি পনেরো থেকে ষোলো শতকের মানুষ।

গোবিন্দদাস বাঙালী হয়েও ব্রজবুলির বিষম পক্ষপাতী। তাই তো বিহারীরা এঁকে মৈথিল বলে সন্দেহ করেন। তখনকার দিনের অনেক বাঙালী কবি মনে করতেন বিশুদ্ধ বাংলায় বুঝি কবিতা ভালো খোলে না। কিছু ব্রজবুলির চাট্ ছাড়লে, অর্থাৎ বাংলার সঙ্গে খানিক মৈথিল ও অপভ্রংশের খাদ মিশাল দিলে, কবিতা যেন জমে ভালো। যেমন, এখনো অনেকের ধারণা উর্দু কি হিন্দিতে লেখা গান বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে যেমন খোলতাই হয়, বাংলায় লেখা গানে ঠিক তেমনি ধারা জুতসই হয় না।

গোবিন্দদাসের যে কবিতাটি তুলছি সেটা কাব্য হিসেবে খুব উঁচুদরের না হলেও, অনুপ্রাসের ছটায় এটি গীতগোবিন্দকেও হার মানিয়ে দেয়।—

সুন্দরি রাধে আও এ বণি
ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি॥
কুঞ্চিতকেশিনী নিরুপমবেশিনী
রসআবেশিনী ভঙ্গিনীরে।
অধরসুরঙ্গিনী অঙ্গতুরঙ্গিনী
সঙ্গিনী নবনব রঙ্গিনীরে॥

কুঞ্জরগামিনী মোতিমদশনী
দামিনীচমকনেহারিণী রে ॥
আভরণধারিণী অখিলসোহাগিনী
পঞ্চমরাগিণী মোহিনী রে ॥
রাসবিলাসিনী হাসবিকাশিনী
গোবিন্দদাসচিতসোহিনী রে ॥

গোবিন্দদাসের আর-একটি পদ :

একে কুলকামিনী তাহে কুহু যামিনী ঘোর গহন অতি দূর ।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর হাম যাওব কোন পুর ॥
একে পদপঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত কণ্টকে জরজর ভেল ।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জাননু চিরদুখ অব দূরে গেল ॥
তোহারি মুরলি যব শ্রবণে প্রবেশিল ছোড়ল গৃহসুখ আশ ।
পন্থক দুখ তৃণ করি না গননু কহতহি গোবিন্দদাস ॥

জ্ঞানদাসের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েরই পদের আশ্চর্য মিল আছে। পদের শেষ লাইনে ভণিতাকারের নাম দেওয়া না থাকলে, চণ্ডীদাসের কি বিদ্যাপতির পদ বলে চালিয়ে দিতে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না।

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে ।
হেন মনে করি ও-দুটি চরণ
সদা লয়ে রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি ।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ॥

নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি যে কলিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কয় তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
ঘরের সকল লোক করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাব আগুনি॥

আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণসৌরভ যখন যেদিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখনি সেদিকে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিনি যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে আহীর নাগরী পিরীতে বান্ধিল তায়॥

মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনী কর অভিসার॥
ঝলকত যামিনী দশদিশ ব্যাপি।
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গ হি মেল।
নব অনুরাগভরে পথ চলি গেল॥

বরিখত ঝরঝর থরতর মেহ।
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥
না হেরিএ নাথ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলুঁ যাঁহা নাগর-রাজ॥

বলরামদাসের একটি পদ :

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমেষ আঁখি।
কোটিকল্প যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে দুইটি নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
হিয়ার ভিতর থুতে না হয় পরতীত।
হারাই হারাই যেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হতে কে কৈল বাহির।
তেঁই বলরামের পঁহু চিত নহে স্থির॥

এখন লোচনদাস :

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস।
আমি নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি॥
আমার অনেক দিবসে মনের মানসে।
তোমাধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও হার করি গলায় পরি।
ফুল নও যে কেশের করি বেশ॥
আমায় নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি।
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে।
আমি চাই বৃন্দাবন পানে॥
এলাইয়া কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালেতে যাই তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কান্দি॥
কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পারি গো
তাহে পরিজন পরিবাদ।
বাজন নুপূর হয়ে চরণে রহিব গো
লোচনদাসের এই সাধ॥

এখন একটি অখ্যাত কবির একটা পদ দিচ্ছি। কবি অন্যদের মতো বিখ্যাত না হলেও যে দু-একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তা পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতো।

শুন লো পরাণ সই
মরম কথা তোরে কই
আমি গিয়েছিলাম যমুনারি কূলে।
(সাঁঝের বেলা)
দেখলাম নন্দের নন্দন কানু
করেতে মোহন বেনু
ব্যাধছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্যসুধা চার
আধ ছটা আঁটা তার
আঁখিপাখী তাহাতে মজিল।
আমার মনমৃগী সেই কালে
পড়িল ব্যাধের জালে
বদ্ধ হয়ে সেখানে রহিল॥

(আমার কি না ছিল সই)
আমার ধৈর্যশালা হেমাগার
গুরুগৌরব সিংহদ্বার
সতীত্ব ধরম কপাট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাত
পড়ে গেল অকস্মাৎ
সমভূম করিল আমায়॥
দন্তশালে মত্ত হাতী
বাঁধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষঅঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি
আবেশে লুকাল ছুটি
পলাইয়া গেল কোন দেশে॥
আছে শুধু প্রাণ বাকি
তাও বুঝি যায় সখি
কি করব কহবি উপায়।
শ্যামানন্দ দাসে কয়
শ্যাম তো ছাড়িবার নয়
পার যদি ধর গিয়া পায়॥

এ তো গেল সামান্য দু-চারটে পদ। এরকম কতশত ভালো ভালো পদ পদ-সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায় তার আর ইয়ত্তা নেই। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির হাজার হাজার করে দু হাজার পদ বাদ দিলেও সংগ্রহগ্রন্থে আরো প্রায় দু শো পদকর্তার পদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, শাক্ত আছে, বৈষ্ণব আছে। এমনকি দু-চারজন স্ত্রী-কবিও যে নেই, তা নয়। প্রতি বছরেই আবার নতুন নতুন পদকর্তাদের পদ আবিষ্কার হচ্ছে। বিশ্বভারতীর পুঁথিখানায় এক নতুন

পদসংগ্রহ পুঁথি আনানো হয়েছে। এর নাম পদমেরুগ্রন্থ। উপর থেকে ভাসা ভাসা যা দেখা গেছে তাতে মনে হয়, কোনো ব্যক্তি এই পুঁথি ভালো করে যত্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করলে অনেক নতুন নতুন পদাবলীর সন্ধান পাবেন।

সে যাই হোক, এখন একালের লেখা আপনাদের যেসব সাধের কবিতা আছে, সেগুলোর সঙ্গে সেকালের লেখা এইসব পদের একবার তুলনা করে দেখুন, উভয়েই সজাতি সগোত্র কি না।

বাংলাদেশের জলহাওয়া আর মাটির গুণে বাংলাদেশের কাব্য হয়ে ওঠে গান। সঙ্গীতপ্রাণ এই কবিতারই নাম লিরিক। সুরের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে হয় বলে, লিরিকে বলার চেয়ে না-বলাটাই হয় বেশি। যেটা বলা হল, সেটা তো খুবই অল্প। অতিশয় ক্ষীণ তার প্রাণ। ছুঁতে-না-ছুঁতেই তা নুয়ে পড়ে। আর তাকে ধরা যায় না। কিন্তু যেটা বলা হল না, তারই ধ্বনি তো মনের মধ্যে অহরহ গুঞ্জন করতে করতে মনের ভিতর এমন-এক অপূর্ব সুরলোকের সৃষ্টি করে যে, তাকে আর যাই হোক, মর্তলোকের কোনো পদার্থ বলে তো কিছুতেই চালানো যায় না।

বাংলার মাটিতে এই গানের আবেগ এতই প্রবল যে, বাংলা এপিক কাব্যেরও প্রাণবস্তুটি হচ্ছে আসলে লিরিক। দেবদেবীদের স্তুতিমূলক মঙ্গলকাব্যে, কাশীরাম দাসের মহাভারতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে তো পদে পদে এই লিরিক প্রাণবস্তুটিই ধরা পড়ে। এমনকি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এপিক কবি মাইকেলের কাব্যও প্রকৃতপক্ষে কতকগুলো বড় বড় লিরিকের সমষ্টিমাত্র।

বাংলাদেশের খাঁটি নিজস্ব ধন যে ছেলেভুলানো ছড়া, তাতেও দেখি, লিরিক রসের ছড়াছড়ি। তবে খাঁটি স্বদেশী মালে আজকাল কারোরই

মনস্তুষ্টি হয় না। এ-ছড়া দিয়ে আজকালকার ছেলেদের মন ভুলানো শক্ত। কারণ আজকালকার ছেলেদের সবাই তো আর বাঙালী মায়ের দুধে মানুষ নয়। তারা কেউ মেলিন্স ফুড বেবী, কেউ-বা গ্ল্যাক্‌সো বেবী, আর কেউ-বা ল্যাক্‌টোজেন কি কাউ অ্যাণ্ড গেট বেবী।

তবু পরখ করে দেখুন, কেমন এইসব ছড়া:

আষাঢ়ে শ্রাবণে কন্যে, গাঙে নতুন পানি।
আর ডম্বুরের শব্দ শুনে ফুকারে বাঘিনী ॥

ওপারেতে কালো রঙ।
বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম ॥
এপারেতে লঙ্কাগাছ রাঙা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥

আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদিয়ে ॥

রাত পোহালো ফরসা হলো কোকিল করে রা।
দুধু খেয়ে যাদুমণি পড়নেতে যা ॥

বিষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদেয় এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান ॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে গোসা করে বাপের বাড়ি যান ॥

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।
বড় সাহেবের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে ॥

আর-একটা একটু মজার রকমের :

বড়বউ গো ছোটবউ গো জলকে যাবি গো।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি গো॥
কেষ্ট বেড়ান কূলে কূলে তাঁত নিবি গো।
তারি জন্যে মার খেয়েছি পিঠ দেখ গো॥
বড়বউ গো ছোটবউ গো আরেক কথা শুন্‌সে।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাঁধা মিনসে॥
ঘটি নেয় না বাটি নেয় না নেয় না সোনার ঝারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥

ঢঙে এবং সুরে এটি ছেলেভুলানো ছড়ার পর্যায়ে পড়লেও এ-ছড়া দিয়ে ছেলেভুলানোর চেষ্টা না করাই ভালো। এর রস একটু বুড়ো ছেলেদের কাছেই জমবে ভালো।

এইসব ছড়ার থেকে কত রকমের যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা আর কি বলব ?

দেখুন তো এগুলো কি রকম :

নদী নদী কোথা যাও।
বাপ ভায়ের বার্তা দাও॥
নদীর জল বৃষ্টির জল যে জলই হও।
আমার বাপ ভায়ের সম্বাদ এনে কও॥

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মউ।
কথা কও না কেন বউ ?
কথা কইব কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে॥

তাল গাছ কাটন
বিষের বাটন
গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বরটা
আমি করব কি ॥

এবার একটা আস্ত ড্রামাটিক লিরিক :

এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥
কাক কালো কোকিল কালো কালো ফিঙের বেশ।
তার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ ॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥
বক ধলো বস্ত্র ধলো ধলো রাজহংস।
তার চেয়েও অধিক ধলো তোমার হাতের শঙ্খ ॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥
জবা রাঙা করবী রাঙা রাঙা কুসুম ফুল।
তার চেয়েও রাঙা কন্যে তোমার মাথার সিঁদুর ॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥
নিম তিতো নিসুন্দে তিতো আর তিতো মাকাল ফল।
তার চেয়ে অধিক তিতো বোন-সতীনের ঘর ॥
এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ ॥
হিম জল হিম স্থল আর হিম শীতলপাটি।
তার চেয়ে হিম কন্যে তোমার বুকের ছাতি ॥

ভরসা করি, জাহ্নমণি আমাদের ফুল্ মার্কস্ পেয়েই পরীক্ষা পাস করেছিল। আর এর পর, কন্যাও জাহুর ঐ প্রচ্ছন্ন স্তবে তুষ্ট হয়ে তার সঙ্গে তার ঘরে যেতে আর কোনো আপত্তি ওঠায় নি।

এ ছাড়া, বাংলার লোকসঙ্গীতে বাউলের গানে পূর্বাঞ্চলের ভাটিয়ালি কি সারি-জারি গানে বাংলার মেয়েলি ব্রতকথার মাঝে মাঝে ধৃত ছড়ায় যে লিরিক রস আছে, তার ব্যাখ্যা দিতে বসলে পুঁথি বেড়ে যাবে। সুতরাং ক্ষান্ত দিলুম।

তবে বাউলগানের একটু পরিচয় দিতেই হয়। বিস্তারে না হোক সংক্ষেপে। কিন্তু তার আগে একটা ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। রেলের গোলমালে গাড়ি বিকেলে না পৌঁছে একটু সন্ধ্যে করেই বোলপুর স্টেশনে পৌঁছল। শুক্লপক্ষের রাত্রি। চারিদিক জোছনায় ভরে গেছে। তখন বাস্-ট্যাক্সির রেওয়াজ ছিল না। গোরুর গাড়িই সম্বল। তারই একটাতে চড়ে বসলুম। শান্তিনিকেতনের মেঠো রাস্তা বেয়ে যেতে যেতে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান গান ধরল। তার একটি লাইন আজ চল্লিশ বছরের উপর ধরেও মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে :

বন পোড়া যায় সবাই দেখে
আমার মন পোড়ে তা কেউ দেখে না।

বাউলগানকে চর্যাগানের একেবারে সোজাসুজি বংশধর বলে উক্তি করলে সে-উক্তি অত্যুক্তি হবে না। তবে মুশকিল এই যে, বাউলগানের প্রাচীন রূপ আমাদের তত চোখে পড়ে না। বাউলরা ভদ্রসমাজে যেমন অবজ্ঞাত, তাঁদের গানও তেমনি এতদিন সমাজে অনাদৃত ছিল। বাউলরা নিজেই তো নিজেদের বাতুল পাগল ক্ষ্যাপা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে মাটি

করেছেন, অন্যের কি দোষ? কাজে কাজেই পদাবলী গানের মতো বাউলগান কেউ সংগ্রহ করে পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করে যান নি।

বাউলগান এই তো সেদিন মাত্র ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাই আমরা এখন যেসব বাউলগান শুনতে পাই তাদের সবই প্রায় অর্বাচীন। অনেক জায়গায় আবার দেখে-শুনে সন্দেহ হয়, ভদ্রজনেরা সংগ্রহ করার পর তাতে নিজেদের হাতও যেন কিছু কিছু বুলিয়েছেন। তবে সম্পূর্ণভাবে বিকৃত করতে পারেন নি। কারণ ভাষার দিক থেকে খানিকটা আধুনিক মনে হলেও ভাবে আর ইডিয়মে বাউলগান চর্যাগানেরই অনুরূপ। বাউলগানেও তো দেখতে পাচ্ছি সহজধর্মের পুরনো সেই কায়সাধনার অর্থাৎ কায়যোগের সুর। তাই তাঁদের মুখে উঠতে-বসতে এই বচন, যা নেই ভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। এবং ঠিক এই কারণেই তাঁদেরও বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানের কোনো বালাই নেই, তাতে ভক্তিশ্রদ্ধাও কিছুমাত্র নেই।

পদাবলী গান গাইবার জন্যে যেমন নতুন ঢঙের কীর্তনের সুর সৃষ্টি হল, বাউলগান গাইবার জন্যেও তেমনি এক বিশিষ্ট বাউল সুরের আমদানি হল। দুইই বাংলাদেশের নিজস্ব সুর। এবং এই দুই সুরই কালক্রমে অন্য শ্রেণীর অনেক গানেও বেশ মানানসই হয়েই চলে গেছে।

নানা জায়গার থেকে উদ্ধার করা খানকয়েক টুকরো টুকরো বাউল-গানের নমুনা দিচ্ছি। এদের পাঠান্তরও অনেক আছে।

তাই তো বাউল হইনু ভাই।
এখন চারবেদের ভেদবিভেদের
আর দাবি-দাওয়া নাই॥
তাই আর তত্ত্বে ফত্তে মন মানে না।
মনের মানুষ চাই-ই চাই॥

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি তাই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥

প্রেমদুয়ারে নানান্ তালা
পুরাণ-কুরাণ তসবী মালা।
হায় হায় এই বিষম জ্বালা
কাঁইন্দ্যা মদন মরে খেদে ॥

মন্ত্রতন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ
দেবে কি সে ধরা।
উপায় দিয়ে কে পায় তারে
শুধু আপন ফাঁদে মরা ॥

ও তোর কিসের ঠাকুরঘর।
যাকে ফাটকে তুই রাখলি আটক
আগে তারে খালাস কর ॥

নদনদী হাতড়ে বেড়াও অবোধ আমার মন।
তোমার ঘরের মাঝে বিরাজ করে বিশ্বরূপী সনাতন ॥
যদুনাথ বাউল বলে, শুন শুন সাধুজন।
কেন আত্মতীর্থ ত্যাজ্য করে মিছে তীর্থ-পর্যটন ॥

আসলে মনের মানুষ না পেলে বেদ-পুরাণ তীর্থ-তপোবন মন্ত্রতন্ত্র মন্দির-মসজিদ বাউলের কাছে সবই বৃথা। তাইতেই তো তাঁরা খোঁজেন :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার হদিসে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ॥

তবু না পেলেম তারে
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে
তাইতে মোরে দেখা দেয় না সে রে ॥

কিন্তু নিজের দেহের মধ্যে চিরদিন আসীন মনের মানুষের একবার সন্ধান পেলে বাউল বলেন :

ধন্য আমি বাঁশিতে তোর
আপন মুখের ফুঁক।
একবাজনে ফুরায় যদি
নাইরে কোনো দুখ ॥
একবারেই ফুরায় যদি
কোনো দুখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজা
আর কি আমি চাই।

তখন মনে চলতে থাকে এক অপূর্ব রসের তরঙ্গ :

আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজলো কি সে
আনন্দে কি মরণে ॥
এখন আমায় ডাকা মিছে
আমার নাইকো হিসাব আগে পিছে ॥
এ তরঙ্গ দেখবি যদি মিলা নয়ন হৃদয়মনে।
এ রঙ্গ দেখবি যদি মন মিলা হৃদ্‌-নয়নে।

এ-তরঙ্গে কোনো বিক্ষোভ নেই, চাঞ্চল্য নেই, অস্থিরতা নেই। এ যে সেই

অপার মহারসের তরঙ্গ। এখানে সুখ-দুঃখ ক্ষোভ-বিক্ষোভ উত্থান-পতন সবই একাকার।

তুমি সুখ পেলে হও সুখভোলা।
(ও মন) দুখ পেলে হও দুখ-উতলা॥
লালন কয় সাধন খেলা।
মহারস যার হৃদ্‌কমলে॥

এই মহারস কিংবা সমরস হৃদ্‌কমলে সত্যি উদয় হলে চিরকালের মতো তো বাঁধা পড়া গেল। আর মুক্তি নেই। কিন্তু সে-বন্ধন কষ্টবন্ধন নয়, মহাসুখের বন্ধন। সেখানে সামান্য মুক্তিমোক্ষের ঠাঁই কোথায়?

হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি॥
ফুটে ফুটে ফুটে কমল ফোটার নাইকো শেষ।
এই কমলের যে-এক মধু রস যে তার বিশেষ॥
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই॥

বাউলগানের পদের মধ্যে লিরিক রসের আস্বাদ পাওয়া গেলেও বাউলগান অনেক জায়গায় কবিতা হতে হতে যেন একটু রয়ে গেছে। সমগ্র বাংলা সমাজের উপর এই গান তেমন কোনো ছাপ দিতে পারে নি, যেমন দিতে পেরেছে পদাবলী গান। তার কারণ আছে। পদাবলী গানের ভিত্তি আসলে নিরেট লিরিক, কোনো সাধনতন্ত্রের উপর তা তো প্রতিষ্ঠিত নয়। এর ভাষাও তাই সাধনমার্গের রূপক ভাষা থেকে মুক্ত। সুতরাং লোকের মনে এর প্রভাব একটু বিস্তৃত হবে বৈকি।

প্রাচীন পদাবলী গানগুলোকে আমরা সাধারণত বৈষ্ণব-কবিতা

বা বৈষ্ণব-পদাবলী বলে আখ্যা দিয়ে থাকলেও এটা তাদের সঠিক আখ্যা নয়।

চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে যে-ধর্মের প্রবর্তন করলেন, তার সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল নামকীর্তন। মহাপ্রভুর ভক্ত শিষ্যেরা বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীন কবিতাগুলো হাতের কাছে পেয়ে তাতে কীর্তনের স্থর জুড়ে দিয়ে, তাদের নামকীর্তনের কাজে লাগিয়ে নিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু যে ছেলেবয়েস থেকে শেষপর্যন্ত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গানের অনুরাগী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবন-চরিতে। গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে:

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত॥

—আদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ, ৪২ শ্লোক

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

—মধ্যলীলা, ২ পরিচ্ছেদ, ৭৭ শ্লোক

একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ সঙ্গে।
অর্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায় রামানন্দ॥

—অন্ত্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ, ৪,৫,৬ শ্লোক

এই কারণেই বোধ হয় এইসব গানের বৈষ্ণব-পদাবলী বলে খ্যাতি। নতুবা দেখা যায়, পদকর্তাদের অধিকাংশই শাক্তধর্মাবলম্বী। অন্তত চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি তো বটেনই। তবে, কাব্যে শাক্ত বৈষ্ণব বলে তো কিছুই নেই। একটা লেবেল এঁটে কবিতার আখ্যা-ব্যাখ্যা দিতে যাওয়াটা অত্যন্ত মূঢ়তার কাজ। আর তা যদি নাই হত, তা হলে ইয়রোপীয়ন ক্রীশ্চানদের লেখা কাব্য আমাদের তো একেবারেই ভালো লাগত না। আমরা বিধর্মীর রচনা বলে তাকে দূরেই ঠেলে রাখতুম।

ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে ব্যবহার হয়েছিল বলেই এইসব কবিতারও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়াটা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এরকম শুধু এদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও অনেক ঘটেছে, দেখা যায়। ইহুদীদের রচিত খ্রীস্টানদের মাননীয় বাইবেলের পুরোনো অংশে রাজা সলোমনের লেখা বলে প্রসিদ্ধ The Song of Solomon নামে এক অতি অপূর্ব প্রেমসংগীত আছে। এই গানের একটা লাইন এইরকম :

> A bunch of myrrh is my well-beloved unto me ;
> he shall lie all night betwixt my breasts.

ধর্মপুস্তকে লেখা আছে বলে ধর্মযাজকদের কৃপায় এই ব্রেস্ট্স আর ব্রেস্ট্স রইল না। গির্জের দু-দুটো চূড়ো বলেই তাদের ব্যাখ্যা চলে গেল।

পদাবলীরও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া রীতি হয়ে দাঁড়ালেও, এটা তাদের আসল ব্যাখ্যা নয়। কাব্যরস অনির্বচনীয়। আখ্যা-ব্যাখ্যা দিয়ে তার কূল-কিনারা পাওয়া শক্ত। পদ্য হয় কবিতা হল, না হয় হল না। যেটা কবিতা হল, সেটা নিয়ে নানাপ্রকার টীকা-টিপ্পনী করা যদিও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তার স্বরূপ শুধু কথা দিয়ে বোঝানো অসম্ভব।

এসব কবিতায় রাধা-কৃষ্ণের নাম আছে বটে, কিন্তু তাঁরা কাব্যজগতে ঠিক স্বর্গের দেবতা নন, অনেকটা মর্তলোকের মানুষেরই মতো। তাঁদেরও সুখ-দুঃখ আছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, মান-অভিমান আছে, এমনকি লজ্জা ভয় ঈর্ষাও আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই কাব্যে দেবতারা মানুষেরই মতো, এবং ঠিক এই কারণেই তাঁরা আমাদের এত আপনার জন। শুধু আধ্যাত্মিকতাই যদি তাঁদের একমাত্র সম্বল হত তা হলে তাঁরা আমাদের এত প্রিয় হতেন কি না সন্দেহ।

ভাষায় লেখা এইসব প্রাচীন কবিতা পড়ে যদি কারোর মনে ধর্মভাবের উদয় হয়, তা হলে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই কবিতাগুলিকে নিছক কবিতা বলেই মেনে নিলে বোধ হয় তাদের প্রতি সদ্বিচার করা হবে। কেবল দেখার বিষয় এইটুকু যে, এগুলোর ভিতর কাব্যের ধ্বনি আছে কি না, আর সেই ধ্বনি মানুষকে এই দৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে কি না, তা সে যতই ক্ষণিকের তরে হোক না কেন।

মুসলমানী আমলের থেকে বাংলা ভাষায় সঙ্গীতপ্রাণ লিরিকের যে-ধারা একবার শুরু হয়ে গেল, আজ প্রায় ছ শো বছর ধরে সে-ধারা অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। সে-ধারা কখনো ক্ষীণভাবে কখনো স্ফীত অবস্থায় প্রবাহিত হয়ে আমাদেরই সময়ের কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পৌছল। তাঁর হাতে পড়ে বাংলা লিরিক এমন-এক ছাপ পেয়ে গেল যে, সে-ধারা আর কখনো লুপ্ত হয়ে যাবে সে-আশঙ্কা এখন নেই। যতদিন বঙ্গদেশ থাকবে, যতদিন বাংলা ভাষা জীবিত আছে, ততদিন বাংলা লিরিকও প্রাণবন্ত হয়ে থাকবে। তবে আমাদের স্বদেশী আমলে বাংলা লিরিক যে ঠিক কী রূপ নেবে, তার বিচারের সময় এখনো উপস্থিত হয় নি। সে-বিচারের ভার আমার পরবর্তীদের উপরই রইল।

উপসংহারে বহুদিনগত সেই অতীতকালের দুটি অপূর্ব বর্ষার গানের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার এই নিবন্ধ শেষ করছি। বর্ষাঘন রাত্রে মানুষের চিরন্তন বিরহী মনের ছবি এই দুটি কবিতায় কথা দিয়ে আঁকা। এর একটি জ্ঞানদাসের, অপরটি বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত।

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে॥
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরি বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝাঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেনকালে॥

সখি হে হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কন্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া॥
কুলিস কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি জায়ত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর জামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

কত শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেল। কত রাজা-বাদশা এল গেল। কত রাজ্য-মসনদ উঠল পড়ল। কত গড়-ইমারত ভাঙল গড়ল। কত মন্ত্রী-উজির, শেঠ-সওদাগর, লোকলস্কর, ধনদৌলত কালের স্রোতে ভেসে চলে গেল। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে বাংলার এই নিজস্ব লিরিকগুলি আমাদের এই বাংলাদেশের মানুষের মনে কি যে অসীম আনন্দের সৃষ্টি করে এসেছে, এবং এর পরে যে কতদিন ধরে সেই একই আনন্দ সঞ্চার করে চলবে, তা কে বলতে পারে।

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর স্থখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল স্থর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
৮৬। গণিতের রাজ্য ॥ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৭। রসাঞ্জন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

* সচিত্র

৮৮। নাথপন্থ ॥ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক
৮৯। সরল ন্যায় ॥ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৯০। খাদ্য-বিশ্লেষণ ॥ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা
৯১। ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
৯২। অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৩। জৈনধর্ম ॥ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন
৯৪। ভাইটামিন ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৯৫। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা ॥ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়
৯৬। বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
*৯৭। জাভা ও বলির নৃত্যগীত ॥ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৯৮। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৯৯। ধম্মপদ-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন
১০০। সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০১। ধনুর্বেদ ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
*১০২। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা ॥ শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
১০৩। তন্ত্রকথা ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
১০৪। বাংলার উচ্চশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*১০৫। কুইনিন ॥ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১০৬। গ্রন্থাগার ॥ শ্রীবিমলকুমার দত্ত
১০৭। বৈশেষিক দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
১০৮। সৌন্দর্যদর্শন ॥ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
১০৯। পোর্সিলেন ॥ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু
১১০। কয়লা ॥ শ্রীগৌরগোপাল সরকার
*১১১। পেট্রোলিয়ম ॥ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
১১২। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

* সচিত্র

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বপরিচয় ১॥০

সুরেন ঠাকুর
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
পৃথ্বীপরিচয় ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
বাংলা সাহিত্যের কথা ১॥০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ব্যাধির পরাজয় ১॥০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু
হিন্দুসমাজের গড়ন ২॥০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
হিউএনচাঙ ২॥০, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
পূজা-পার্বণ ৩৲, ৪৲